ভারতে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনা

প্রথম প্রশ্ন হল, সাম্প্রতিক কালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির হার কমেছে কি না। জবাব, হ্যাঁ, কমেছে। যুগপৎ জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার কমেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে বাস্তব স্থূল অভ্যন্তরীন উৎপাদন (GDP) ছিল ৭.৯ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়ায় ৬.৯ শতাংশে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এই হার আরও কমে হয় ৬.৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৫ শতাংশ। একই নিরিখে, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়ায় ৫.৫ শতাংশে। জাতীয় আয়বৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির এই হার গত অর্ধ দশকে সর্বনিম্ন।

এই পতন প্রতিফলিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে। গাড়ি, বাড়ি এবং, দ্রুতবিক্রয়যোগ্য ভোগ্যদ্রব্য যথা, প্যাকেটজাত দুধ, মাখন, ফলের রস, ঠান্ডা পানীয়, নুডল্স, টুথপেস্ট, সাবান ইত্যাদির চাহিদা কমেছে। ফলে, এইসব শিল্পক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বেকারত্ব। আটটি মহানগরীতে ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ এই তিন বছরে প্রতিবছর গড়ে প্রায় সাড়ে ন'লাখ তৈরি বাড়ি অবিক্রিত থেকেছে। বাড়িনির্মাণের সঙ্গে জড়িত পণ্য যথা সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদির চাহিদা কমাও স্বাভাবিক। সরকারি তথ্যেই প্রমাণ, ২০১৭-১৮-এর তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ব্যাংকের খুচরো ঋণ, ইস্পাতের চাহিদা, নতুন ঘোষিত বিনিয়োগের পরিমাণ, পুরনো বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ, মোট রাজস্ব এবং নিট রফতানি কমেছে। সুতরাং, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। গাড়িনির্মাণ শিল্পেই ছাঁটাই হয়েছেন আড়াই লাখ কর্মী এবং আনুমানিক দশ লাখ কর্মী ছাঁটাই হয়েছেন গাড়িনির্মাণ শিল্পের আনুষঙ্গিক শিল্পক্ষেত্রে।

সর্বভারতীয় হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কর্মহীন হয়েছেন এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ। জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ সময়কালে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে সাধারণ বা, দীর্ঘকালীন মানদণ্ডে ৬.১ শতাংশ এবং সাপ্তাহিক বা, স্বল্পকালীন মানদণ্ডে ৮.৯ শতাংশ। এই বেকারত্বের হার গত অর্ধ শতকব্যাপী সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং ২০১১-১২ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এই সংকট কি স্বল্পকালীন না কি, দীর্ঘকালীন কারণজনিত না কি, চক্রাকার বাণিজ্যিক গতির একটি পর্যায়? জবাব খুঁজতে সামান্য পিছনে তাকানো যেতে পারে। প্রথমবার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ কেন্দ্রে সরকার গঠন করে ২০১৪ সালের মে মাসে। ইউপিএ সরকারের শেষ কয়েক বছর এবং এনডিএ সরকারের প্রথম কয়েক বছরে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

দুই জমানার অর্থনৈতিক সূচকের মধ্যে চমকপ্রদ কোনও প্রভেদ নেই। তবে, ইউপিএ জমানার তুলনায় এনডিএ জমানায় কৃষিজ পণ্য এবং শিল্পপণ্য এই দুইয়েরই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বেসরকারি ভোগব্যয় কমেছে। খাদ্য ও সুরাসার-রহিত পানীয়, পোশাক ও পাদুকা, গৃহসজ্জা, অন্যান্য গার্হস্থ্য উপকরণ, আংশিক স্থায়ী দ্রব্য (যেমন, কাচ বা চীনামাটির কাপ-প্লেট, প্লাস্টিক বা থার্মোকল, মোবাইল চার্জার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম), অচির দ্রব্য (যেমন, ভোজ্য তেল, ওষুধ, আইসক্রিম, সবজি) প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা কমলে অনুমান করা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নতির চিত্রটি হতাশাব্যঞ্জক।

এই সংকট অর্থনৈতিক বা, বাণিজ্যিক চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বা, স্বল্পকালীন ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে হঠাৎ উদ্ভূত ঘটনা মনে হয় না। পরিস্থিতির কারণ হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে কয়েকটি বিষয় চোখে পড়ে। ১) চাহিদার ঘাটতি; ২) স্থূল মূলধন গঠনের হার হ্রাসপ্রাপ্তি; ৩) কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনী ব্যয়ের হ্রাসপ্রাপ্তি; ৪) নিট রফতানি কমেছে; ৫) জিএসটি-এর ফল দেখা যাচ্ছে ক) অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও বাধা, খ) রাজস্ব আদায় কমেছে; ৬) ২০১৬ সালের নোট বাতিল করার ফলে ক) গ্রামীণ নগদনির্ভর অর্থনীতিতে ধাক্কা, ফলত চাহিদা ও বিনিয়োগ দুইয়েরই অধঃপতন, খ) মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ীদের কারবারে সংকোচন, ৭) নোট বাতিল ও বর্ধিত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট নগদের জোগান না থাকা এবং লেনদেনকে সরকারি উদ্যোগে ক্রমবর্ধমান ডিজিটাইজ করে তোলার চেষ্টার ফলে নগদের আকাল ইত্যাদি। অথচ, সুদের হার কমতে থেকেছে!

অর্থমন্ত্রী একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। বিদেশি বিনিয়োগে করছাড় দেওয়া হবে, সরকার পুরনো গাড়ি বাতিল করে নতুন গাড়ি কিনবে, ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বেশি ঋণ দেবে, নিগমিত শিল্পসংস্থাগুলি সামাজিক দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হলেও আপাতত তাদের অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না, ইত্যাদি। এছাড়া, দশটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংককে তিনটি ব্যাংকে পরিণত করার ঘোষণা

হয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বিমল জালান কমিটির পরামর্শ মেনে ১,৭৬,০৫১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে চালান করতে রাজি হয়েছে। দেশে শুরু হয়েছে বিতর্ক যে, এগুলি সংকটমোচনের কাজে কতটা সফল হবে।

সামান্য গভীরে পর্যালোচনা করলে, আজকের পরিস্থিতির জন্য শুধুমাত্র এনডিএ বা, বিজেপি সরকারকে দায়ী করা চলে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চড়া রং বাদ দিলে, গত প্রায় চার দশক ধরে অন্যান্য যে দলগুলি দেশের সরকার চালিয়েছে তাদের সঙ্গে বিজেপির মূলগত ফারাক নেই। অর্থনীতির ছাত্র মাত্রেই জানে, অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্তর ফারাক। অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ শুধুমাত্র কয়েকটি গণনাযোগ্য সূচকের উপর নির্ভর করে যেমন, জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি। এই সূচকগুলি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির গুণবিচার করতে অক্ষম। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে অগণন গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর যেমন, আয়ের বৈষম্য কমা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তৃত এবং কার্যকরী হওয়া ইত্যাদি। ভারতবর্ষের শাসকেরা গত প্রায় চার দশকে, মুখে উন্নয়ন এবং ইনক্লুসিভ গ্রোথের কথা বললেও, অর্থনীতির যে গাড়ি ভারতের রাজপথে চালিয়েছেন তাতে স্পিডোমিটার দেখায় শুধু জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার। এবং, তা চীনের চেয়ে কম না বেশি! অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলে স্পিডোমিটারের কাঁটা ওই হারই বাড়ায় শুধু। গাড়ি গলিপথে বা, আলরাস্তায় ঢোকে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইনক্লুসন হয় না। উন্নয়ন না ঘটলে একসময় উন্নতির রাস্তা থমকে যেতে বাধ্য।

বর্তমান সমস্যাকে বুঝতে গলিপথে এবং আলরাস্তায় নামতে হবে। নামলেই দেখা যাবে, দেশে আয়বৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ১৯৮০ সালে দেশের উচ্চবিত্ত এক শতাংশ মানুষ ছিল ৭ শতাংশ আয়ের মালিক। তারপর বৈষম্য বাড়তে শুরু করে রকেটের গতিতে। ১৯৯৫ সালে দেশের এক শতাংশ মানুষের পকেটে ছিল দেশের ১৩ শতাংশ আয়, ২০১২ সালে ২২ শতাংশ। সম্পদের নিরিখে বৈষম্য আরও প্রকট। ১৯৯১ সালে এক শতাংশ মানুষ ছিল দেশের মোট সম্পদের ১৭ শতাংশের মালিক, ২০১২ সালে ২৬ শতাংশের। ২০১৭ সালে, মাত্র এক বছরে, দেশে যে পরিমাণ সম্পদ গঠিত হয় তার ৭৩ শতাংশ যায় ওই এক শতাংশ উচ্চবিত্তের হাতে। তারা দেশের মোট সম্পদের ৫২ শতাংশের মালিক হয়ে দাঁড়ায়। দেশের দশ শতাংশ মানুষের হাতে থাকে মোট সম্পদের ৭৭ শতাংশ। একই সময়ে তলার দিকের ৬০ শতাংশ মানুষের হাতে দেখা যায় দেশের মোট সম্পদের মাত্র ৫ শতাংশ। এই তো হল পরিস্থিতি।

অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো থেকে শুরু করে জন কেইন্‌স, সাম্প্রতিক কালের জঁ তিরোল, থমাস পিকেটি, ব্রাংকো মিলানোভিচ, জেমস গলব্রেথ প্রমুখ তথাকথিত মূলস্রোতের অর্থনীতিবিদেরা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদের বৈষম্যবৃদ্ধি, কারবার ও পুঁজির একচেটিয়াকরণ ইত্যাদি সম্ভাবনা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। এরা যে সমাধানের কথা বলেছেন তাতে মূল সূত্রটি হল সরকারকে প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে। পুঁজিনির্ভর অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতিকে যথেচ্ছাচার করতে দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু, সরকার পুঁজিপতির সঙ্গে হাত মেলালে? তাহলে সমস্যা। এবং, এই জিনিসটিই বারংবার ঘটে।

সারা বিশ্বেই ইদানীং বৈষম্য বেড়ে চলেছে। পূর্বোল্লিখিত অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, ১) শক্তিশালী কারবারী সবসময়েই চেষ্টা করবে বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি করতে; ২) পুঁজিপতির মুনাফা যে হারে বাড়বে, শ্রমিকের মজুরি তুলনায় অনেক কম হারে বাড়বে। সেক্ষেত্রে, আয় ও সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া এবং এই বৈষম্যের লাগাতার বৃদ্ধি অনিবার্য; ৩) ফলে, দেখা দেবে ভোগের বৈষম্য; ৪) লিঙ্গবৈষম্য বাড়বে; ৬) ভারতের মতো দেশে বাড়বে আঞ্চলিক ও জাতপাত-ভিত্তিক বৈষম্য।

এই সমস্তকিছুই হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার যার পিছনে স্পষ্টতই দায়ী পুঁজিপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা একযোগে ঘটিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ। কিন্তু, এর একটি পরিণতি হল – পণ্যের বাজারে চাহিদার ক্রমসংকোচন। ফলত, অর্থনৈতিক সংকট যেমনটি আজ ভারতবর্ষে আমরা দেখছি।

অর্থনীতিবিদেরা যে-ক'টি বিষয়ে সাবধান করেছেন তার প্রায় প্রতিটিই ভারতবর্ষে মজুত। ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদের বৈষম্যের বিষয়টি ইতিমধ্যেই উল্লিখিত। জাতীয় আয়ে মজুরির হার ক্রমাগত কমতে থাকা এবং মুনাফার হার ক্রমাগত বেড়ে চলার ঘটনাটিও ভারতে গত চার দশক ধরে দ্রুতগতিতে ঘটছে। ১৯৮০-৮১ সালে মজুরি ছিল জাতীয় আয়ের ২৮.৫ শতাংশ এবং মুনাফা ছিল ১৫.৭ শতাংশ। ২০১২-১৩ সালে মজুরির হার নেমে আসে ১১ শতাংশে এবং মুনাফার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪.১ শতাংশে। অর্থাৎ, পুঁজির মালিক তার প্রাপ্যের তুলনায় অনেক বেশি আদায় করেছে। কারণ, সে পুঁজির মালিক এবং পুঁজি অপ্রতুল। জমির মালিক রেন্ট বা খাজনা পায় কারণ জমি অপ্রতুল। সেইভাবেই যেন পুঁজির মালিক তার প্রাপ্যের বাইরে অনেকটা খাজনা আদায়

করছে। এর নাম রেন্টিয়ার ক্যাপিটালিজম। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন যে, পুঁজি এইভাবে বিরল বা, অপ্রতুল হওয়ার কারণ নেই। কারণ, জমি সৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু পুঁজি গঠন করা যায়।

ভারতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে বেসরকারি নিগমবদ্ধ সংস্থাগুলির প্রভাব হয়ে উঠেছে মারাত্মক। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯১-৯২ সাল অবধি শিল্পোৎপাদনী ক্ষেত্রের উৎপাদনে ৪২.১ শতাংশ অবদান ছিল পাবলিক কর্পোরেটের এবং ৪৭.৫ শতাংশ প্রাইভেট কর্পোরেটের। ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৭-০৮ সাল অবধি সময়সীমায় একই ক্ষেত্রে পাবলিক কর্পোরেটের অবদান দেখা যাচ্ছে ১৯.২ শতাংশ এবং প্রাইভেট কর্পোরেটের ৭২.৬ শতাংশ। প্রাইভেট কর্পোরেটের এই অগ্রগতি শুধুমাত্র পাবলিক কর্পোরেটের অধোগতির ফলে ঘটেনি। প্রাইভেট কর্পোরেটের সঙ্গে যুদ্ধে হার মেনেছে আসলে হাউসহোল্ড সেকটর অর্থাৎ, মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প।

ভারতে প্রাইভেট কর্পোরেটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে – ১) বর্তমানে এমন সংস্থার সংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ। ২) এদের মাত্র ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ সক্রিয়। ৩) তাহলে, বাকি ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ নিষ্ক্রিয় সংস্থা কী করে? বেশিরভাগই বড় কোনও সংস্থার কালো টাকা সাদা ও সাদা টাকা কালো করে। ৪) সক্রিয়দের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান গুটিকয়। ৫) এরা বড় সরকারি বরাত পায়, সরকার ও প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ, এরা পছন্দমতো রাজনৈতিক দলগুলিকে আর্থিক সহায়তা করে। ৬) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে শোধ করে না। বেশিরভাগই থেকে যায় আইনের আড়ালে এবং নেতাদের আশ্রয়ে। ৭) এদের সম্পদ ও দেনার অনুপাত ভয়াবহভাবে খারাপ অর্থাৎ, ঘটি-বাটি বেচেও এরা পাওনাদারের (সরকারি ব্যাংকের) ঋণ শোধ করতে সমর্থ নয়। অর্থাৎ, এরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারের যোগ্য নয়। তবু এদের অধীন সংস্থার ঋণ পুনর্বিবেচিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়।

এরা দুর্বৃত্ত পুঁজিপতি। এরা এবং এদের সহায়ক সরকার তখনই বিপদে পড়ে যখন এই তাণ্ডবে জনতার আয় বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পায়, সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায় এবং, পুঁজিপতি সামনে দেখে লোকসান এবং বন্ধ বাজার। সরকার স্টিমুলাস প্যাকেজ ঘোষণা করে যাতে এই দুর্বৃত্তরা টিকে থাকে।

রোগের প্রকৃতি স্বল্পকালীন নয়। ফলে, স্বল্পকালীন ব্যবস্থাপত্র আপাতদৃষ্টিতে সংকট কিছুটা মোচন করলেও করতে পারে বিশেষত, দুর্বৃত্ত পুঁজিপতিরা আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু, সমস্যা

থেকেই যাবে এবং আবার প্রকট হবে। তাকে বাণিজ্যিক চক্রজনিত সংকট বলে প্রচার করতে চাইলে সে হবে মিথ্যাচার। সরকারকে সৎ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিতে হবে। বিকল্প নেই।